অবকাশ

কেমন লাগছে 'অবকাশ'? জানান আপনাদের মতামত। থাকে যদি কিছু পরামর্শ, তাও জানান। সানন্দে গ্রহণ করব আমরা।

আরও কিছু জানতে বা জানাতে এবং লেখা পাঠাতে-ঃ -

মোবাইল ৯৫৬৪০৬৫৫৫৫ অথবা ই-মেল lipiarambagh@gmail.com

যে ঠিকানায় লেখা পাঠাবেন -

দেবাংশু চক্রবর্তী, আর্থিক লিপি, ওয়ার্ড নং ৪, কোর্ট পাড়া, পোঃ-আরামবাগ, জেলা ঃ হুগলি, পিন-ঃ ৭১২৬০১

সংসার

আশিসবরণ সামন্ত

এই বাড়িটার কথাই বলেছিলে? এই তোমাদের অভিজাত্যের মাপকাঠি? মাটির দেওয়াল, খড়ের ছাউনি, ভেঙে পড়া দেওয়ালে উই-ইঁদুরের বাসা, কেন্নোর উৎপাত। এই বাড়ির জন্য তোমাদের এত অহংকার! তোমার সাথে জড়িয়ে পড়ার আগে যদি একদিনের জন্যও দেখতাম, তাহলে তোমার হাতের সিঁদুরের ছোঁওয়া নিয়ে জীবনটাকে এভাবে অসময়ে নষ্ট করে ফেলতাম না। বিয়ের আগে তো অনেক কথাই বলেছিলে। রাজার বাড়ির আনন্দ পাবে, পরিজনের সেবা পাবে। কিন্তু, তার বদলে পেলাম কী? পরিজনদের সেবা করতে করতেই হাড় হিম হয়ে যাচ্ছে।

বিয়ের মাসখানেক পরেই এই কথাগুলো শুনতে হয়েছিল ঋষিণকে। চিত্রিতার জ্ঞানগর্ভ এরকম জ্বালাময়ী বাণী শুনতে শুনতেই কানগুলো নিয়মিত ঝালাপালা হয়ে উঠেছিল ঋষিণের। শুনতে হবেই। এটাই জাগতিক নিয়ম।

প্রাচীন জমিদার বাড়ি হলেও বেশ ছোট্ট পরিবার। মতীশ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের রেলওয়ে ডিপার্টমেন্টের অবসর প্রাপ্ত অফিসার। অবসর নিয়েছেন বছর পাঁচেক হল। পাঁচটি প্রাণীর সংসারে নিজের কর্তৃত্ব বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই বজায় রেখে আসছিলেন। প্রৌঢ়া স্ত্রী অনুমিতা। বয়স ষাট-এর ঘর ছুঁতে চলেছে। মতীশবাবুর থেকে মাত্র বছর তিনেকের ছোট। তা হলে কী হয়, বেশ মনে হচ্ছে, যে বয়স হয়েছে। তাঁদেরই একমাত্র ছেলে ঋষিণ। সি.এ করে বেশ নামিদামি কোম্পানিতে চাকরি করছে। তা প্রায় বছর দশেক হল।

বিয়ে করেছে। বিয়েটা অবশ্য দেখে শুনে বাজিয়ে করার সুযোগ হয়নি। যদিও প্রেম করে। আকস্মিক প্রেম। অসাবধানতাবশত প্রেম যে তাকে এমনি করে জড়িয়ে জাপটে ধরবে তা কোনদিনও ভাবতে পারেনি। চাকরি জীবনেই তাদের প্রেম। বেশ পরিণত বয়সে। আজকালকার স্কুল কলেজে পড়ুয়াদের মতো আবেগে প্রেম নয়।

চাকরি করে কোলাঘাটে। অফিস থেকে ফিরছে। বোম্বে রোড। বেশ লম্বা চওড়া রাস্তা। নিজেরই মোটর সাইকেল। বেশ দ্রুততার সঙ্গেই চালিয়ে আসছে। রাস্তায় যে এমনি করে দুর্ঘটনায় পড়তে হবে তা ভাবতে পারেনি সে। দেউলিয়া বাজার। কোলাঘাটের তিরিশ চল্লিশ কিলোমিটারের মধ্যে এই এলাকাটিতে চাকরি নয় তো বা ব্যবসা কম বেশি, প্রায় সকলেই করে।

রাস্তার ধারে বাড়ি। একেবারে গা ঘেঁষে। কলা খাচ্ছিল মেয়েটি। কলার ছোবড়াটি ফেলতে যায় ড্রেনে। সামান্য একটু জোরে ছুঁড়তেই গিয়ে পড়ে রাস্তায়। এক একটা এলাকার লোকেদের বেশ বদ্‌স্বভাব আছে। এখানকার লোকেরাও তার ব্যতিক্রম নয়। বুকের ওপর দিয়ে রাজপথ যেতে হবে, আবার রাজপথের ওপরে বাড়ি বাড়াতে হবে। ভীষণ খারাপ অভ্যাস। অথচ হচ্ছে, হবে। প্রতিকার নেই। করবেই বা কে? কম বেশি সবাই যে যার ধান্দার অসুখে ভুগছে। ছোবড়াটি ফেলেই বলে—

ইস্! ছোবড়াটি রাস্তায় ছুঁড়ে ফেললাম। কার সর্বনাশ হবে কে জানে!

বলা মাত্রই সাঁ করে মোটর সাইকেলটি নিয়ে ৭০ কিমি বেগে আসা ঋষিণ স্লিপ খায়। হুড়মুড় করে গিয়ে পড়ে ড্রেনে। চিত্রিতা ছুটে বেরিয়ে আসে রাস্তায়। মুখে উঃ— শব্দ করে ঋষিণকে তুলে ধরে। হাতপা ছিঁড়ে গেছে। আঘাতও বেশ লেগেছে। সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই জড়ো হয়। তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা করায়। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকে। তারপর কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠে গাড়ি নিয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়ায়। চিত্রিতা বলে—

প্লিজ কিছু মনে করবেন না। আমিই ছোবড়াটি ফেলেছিলাম। বিশ্বাস করুন, ইচ্ছা করে নয়। কিন্তু আমিই দায়ী। যদি কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে যেত, কী সর্বনাশ হতো।

না না ও কিছু নয়। নিছক দুর্ঘটনা। এটা তো প্রাকৃতিক নিয়মেই ঘটেছে। কিছু করার নেই।

বেশ বিনয়ের সঙ্গে কথাগুলো বলেছিল ঋষিণ। চিত্রিতা সঙ্গে সঙ্গে কিছু দূর হেঁটে গিয়েছিল। কথা প্রসঙ্গে পরিচয়ও জেনে নিয়েছিল ঋষিণের। প্রতিদিন ঋষিণকে ঐ পথেই যাতায়াত করতে হয়। পরের দিনই মোটর সাইকেল নিয়ে যায়। কাছাকাছি এসে গাড়ি স্লো করে তাকায়। দরজায় দাঁড়িয়ে হাত নাড়ে চিত্রিতা। মাঝে মাঝে নামতেও হয়। চা বিস্কুট টিফিনটা না খেলে ছাড়ে না সে।

বেশ স্বচ্ছল পরিবার। ছিমছাম পরিবেশ। ছোট্ট সংসার। বাবার একমাত্র মেয়ে। ফিলোজফিতে এম.এ করে বছর সাতেক হল বসে আছে। চাকরি হয়নি। চেষ্টা চালিয়েও হয়নি। শিক্ষকতা করতেই চেয়েছিল। কিন্তু ফিলোজফি এমন একটা বিষয়, স্কুলে যার ভ্যাকান্সি কদাচিৎ হয়। চাকরির বয়সের উর্দ্ধসীমা অতিক্রম করতে আর মাত্র বছর পাঁচেক বাকি। সাত বছরে হল না। আর পাঁচ বছরে হবে? একটা নৈরাশ্য তাকে জড়িয়ে ধরে। তাদের এই পরিণত বয়সের আকর্ষণ বাড়তে বাড়তেই প্রেম এবং সেই প্রেমেরই পরিণতিতে বিয়ে।

বিয়ের পরেও গ্রাম থেকে যাতায়াত করে ঋষিণ। ছাতিমতলা গ্রাম থেকে পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরে কোলাঘাট। যাতায়াতে সত্তর। এক লিটার পেট্রোলেই যাতায়াত হয়। নিজের গাড়িতে আসা যাওয়া করার ফলে অনেক সময় সাশ্রয় হয়। চিত্রিতা একটু বাইরে বের হবার আশায় চাকরি করতে চেয়েছিল। শিক্ষকতা তো হলই না, অন্যান্য চাকরির বাজারও বেশ মন্দা। তাই স্বামীর সংসারেই চাকরি করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না তার।

এদিকে তাদের চারজনের সংসারে এক আগন্তুক এসেছে। সংহতিব্রত। দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রেম এবং বিয়ে। তারপর চাকরিকে কেন্দ্র করে অশান্তি। শেষে বৃদ্ধ শাশুড়ির সঙ্গে এক সংসারে থাকা, এই নিয়ে প্রথম থেকেই যেন চিড় ধরেছিল তাদের সম্পর্কে। ঋষিণ তাই উভয়ের মেরুবন্ধন করার জন্যই বুঝি বা নাম রেখে ছিল সংহতিব্রত। দেখতে দেখতে বছর পাঁচেক বয়স হল তার।

চিত্রিতা বার বার খোঁচা দেয়। বলে—

তোমার এত কষ্ট করে যাতায়াত কি না করলেই নয়? থাকলেই বা গাড়ি। তেলেরও তো একটা খরচ আছে। তাছাড়া শারীরিক কষ্ট। একটা টেনশন। সবই তো ভোগ করতে হচ্ছে। কোলাঘাটে কি একটা বাড়ি ভাড়া মিলবে না? না পারো আমায় বলো— আমিই দেখছি। আমার পক্ষে সম্ভব নয় এভাবে গাঁয়ে পড়ে থাকা। শহরে চলো। যে এসেছে তারও তো একটা ভবিষ্যৎ আছে। এখানে কি পড়াশোনা হয়, না তার পরিবেশ আছে?

বিয়ের পর থেকেই যখনই ঋষিণ মধু খেতে যায় মৌমাছি তখনই হুল ফোটায়। মধু কোনদিনই তার মুখে গিয়ে পড়ল না। শুধু হুলের জ্বালাটাই তার ভাগ্যে জোটে।

চিত্রিতাকে বছর পাঁচেক আগে কয়েক সপ্তাহের জন্য যেতে হয়েছিল কোলাঘাটে। ঋষিণ একটা অস্থায়ী বাসা এক মাসের জন্য নিয়ে ছিল। ঐ বাসা থেকেই হাসপাতালে ভর্তি করেছিল চিত্রিতাকে। হঠাৎ প্রয়োজন হলে গ্রাম থেকে নিয়ে যেতে কষ্ট হবে--- তাই। ডেলিভারির পর সে আর গ্রামে ফিরতে চায়নি। কোলাঘাটে না হোক দেউলিয়া বাজারে বাপের বাড়িতেই থেকে যেতে চেয়েছিল চিত্রিতা। শেষে ঋষিণ তার প্রশাসনিক অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ফিরিয়ে এনেছিল দেশের বাড়িতে। নাতিকে পেয়ে সে দিন দাদু-ঠাকুমা কী দারুণ খুশি।

পাঁচ-ছটা বছর কোনরকমে কাটালেও শেষ পর্যন্ত পারল না। হেরে গেল শান্তির নীড় খোঁজার বাসনার কাছে। অবশেষে টাকা দিয়ে শান্তি কেনার সিদ্ধান্ত নিতে হয় ঋষিণকে। বাড়ি ঠিক করে ফেলে কোলাঘাটে। দুটি রুম। কিচেন আর সেপারেট বাথ। মাসিক হাজার টাকা ভাড়া। ঋষিণ চেয়েছিল আরও একটা রুম ভাড়া নিতে। চিত্রিতার নেতিবাচকও উত্তর সে কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

ঋষিণ এই গ্রামেই লেখাপড়া করেছে। তার বাবা রেলওয়ে অফিসার হলেও ছেলেকে ট্রান্সফারের সঙ্গে সঙ্গে নানা জায়গায় ছুটিয়ে ভবঘুরে করেননি। বরং একই জায়গায় রেখে গ্রামের ইস্কুল থেকেই ভালোভাবে পাশ করিয়ে সি এ করে তুলেছেন। বর্তমানে অবশ্য যুগ পাল্টে গেছে। পরিবেশেরও বিরাট পরিবর্তন হয়েছে। এখন শহরমুখী সভ্যতা হু হু করে গ্রামকে গ্রাস করে ফেলছে। মানবিকতা পিছু হটছে। আসছে যান্ত্রিকতা। কেউ ঠেকাতে পারবে না। কিন্তু কিছুটা প্রয়োজনে। অনেকটাই অপ্রয়োজনে। তবুও মেনে নিতে হবে। প্রতিযোগিতার বাজারে সবাই নিরুপায়। নাতি সংহতিব্রতকে পড়াতেন মতীশবাবু। অনুমিতা পাশে বসে খবরের কাগজের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে তা দেখতেন। বেশ যত্ন করেই ইংরেজি পড়াতেন, আবৃত্তি সেখাতেন। হারমোনিয়ামে সা রে গা মা পা ধা নি পর্দাগুলো দেখিয়ে দিয়ে নিজের গলা মেলাতেন। আর, ঠিক তারপরই অঙ্ক শেখাতেন। যখন ক্লান্তি আসত তখন খেলতে বসাতেন। ছোট দাদুভাইকে ছেলের থেকে অনেক শিক্ষিত করে তোলার স্বপ্ন দেখতেন। দীর্ঘ পাঁচ পাঁচটি বছর তারা দাদুভাইকে নিয়ে রিটায়ার্ড জীবন কাটাতে কাটাতে ভুলেই গিয়েছিলেন তাঁর অবসরজীবনের কথা। সব সময় কাজ আর কাজ। খাওয়ানো, সময়ে সময়ে পড়ানো, খেলানো এইসব হাজারো কাজে তাঁদের দিন রাত কখন যে পার হয়ে যেত তা খেয়ালই করতে পারতেন না।

অবসরের পর পি এফ এর টাকা তুলে তৈরি করেছিলেন চার কামরার বাড়িটা। ডাইনিং, কিচেন, ডবল বাথ। পাশেই ড্রয়িং রুম। রিডিং রুমও ছিল দক্ষিণ দিকে। জানালার পাশে। নাতির জন্মের বছরেই করেছিলেন বাড়িটা। নাম দিয়েছেন নাতির নামেই --- সংহতি। বাইরে কলিং বেল। ছাদে বাহারি ফুলের গাছ। সব মিলিয়ে বেশ ছিমছাম পরিবেশ। গ্রামে যে এত সুন্দর শহুরে পরিকাঠামো তৈরি করা যায় তা শহরের লোক কোনদিন ভাবতেই পারবেন না। সবই মতীশবাবুর কৃতিত্ব।

ক্রমশ

নাটক ঃ গোপালের উপহার

নাট্য রচনা ঃ দেবাংশু চক্রবর্তী পর্ব ৩

৬ষ্ঠ দৃশ্য

(রাজসভা, রাজা বসে আছেন, এমন সময় প্রজাদের প্রবেশ)

এসেই সকলে : মহারাজ, আমাদের বাঁচান মহারাজ, আমরা যে এবার মরে যাবো।

রাজা : কী হলো, কী হলো? এভাবে সকলে মিলে....

মন্ত্রী : ন্যাকামি মহারাজ। ওদের আমি চিনি। সবকটাকে চাবকে সিধে করে দিতে হয়, হতচ্ছাড়ারা..

রাজা : আঃ মন্ত্রী, প্রজাদের প্রতি এ কী ব্যবহার তোমার? সকলেই তো গরিব চাষি নাকি? বলো বলো, তোমাদের কী হয়েছে, নির্ভয়ে বলো।

প্রজা : মহারাজ, মাত্র বিঘে খানেক জমি। বৃষ্টি নেই কতো দিন। মহারাজ দয়া করে যদি এই অধমের খাজনাটা একটু...

সকলে : হ্যাঁ, মহারাজ, খাজনা যদি মাফ করে দিতেন।

মন্ত্রী : দেখলেন মহারাজ, প্রথমেই বলেছিলাম, এরা প্রত্যেকে এক একটা ধান্দাবাজ।

রাজা : আঃ, মন্ত্রী, বিষয়টা আমি দেখছি। তুমি হঠাৎ করে এব্যাপারে কোনও মন্তব্য করবে না।

মহারাজ : আমাকে দুটো দিন সময় দিন। আমি আপনাদের আমার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেব।

সকলে : আমাদের কথা একটু দয়া করে ভাববেন মহারাজ। খাজনা মুকুব না করলে খেতে পাবো না আমরা। প্রণাম মহারাজ। দীর্ঘজীবী হোন আপনি।

(প্রজাদের প্রস্থান)

মন্ত্রী : যাক, বাঁচা গেলো। এবার পুরস্কারটা...

মহারাজ : মন্ত্রী, তুমি কিন্তু দিন দিন লোভী আর হিংসুটে হয়ে যাচ্ছো। নিজেকে ঠিক করো। না হলে আমি মন্ত্রী পরিবর্তন করতে বাধ্য হব, বুঝলে?

(মন্ত্রী লজ্জায় মুখ নামালেন)

কবি : মন্ত্রী, তুমি তোমার কাজটা মন দিয়ে গো সারো
মাথায় রাখো সুবুদ্ধি, আর কুবুদ্ধিটা ছাড়ো।
নইলে খাবে লাথির আঘাত, ভাঙবে কোমড় খানি।
তুমি যে বিচ্ছু, দুষ্টু ভীষণ, এটা তো আমরা জানি।

মহারাজ : বাঃ বেশ বেশ, কবি। ভালোই লিখেছো তুমি, তবে ওই লাথি শব্দটা একটু অসভ্য হয়ে যাচ্ছে নাকি?

কবি : মহারাজ, আসলে আধুনিক কবিতা তো। এখন তো সব চলে, শুয়োরের বাচ্ছা, হারামজাদা...

মহারাজ : আঃ কবি, থামো থামো। ঠিক আছে ঠিক আছে। এটা আমার জানা ছিল না তো, তাই ... আর তাছাড়া রাজসভায় জ্ঞানীগুনী ব্যক্তিরা আছেন তো। একটু সংযত হওয়া বোধ হয় ভালো। (একটু থেমে) আপনারা যে যার মতো করে লিখে এনেছেন তো? সেনাপতি, কোথায়? বলো— কী লিখেছো শুনি।

সেনাপতি : আমার মতে, সেরা বুদ্ধিমান হলো গোপাল ভাঁড়। কারণ যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি বা বিপদে আপদে তার বুদ্ধিতেই তো আমরা উদ্ধার পেয়েছি মহারাজ। কথাতেই তো আছে, এই অসির থেকে মসি শক্তিশালী।

রাজা : ঠিক আছে, ঠিক আছে। নাও বুঝেছি, কবিরাজ মহাশয়ের কী বক্তব্য, শুনি এবার।

কবিরাজ : মহারাজ, অনেক কঠিন রোগ আছে এই জগতে। যার নিরাময় আমরাও করতে পারি না। কিন্তু মন প্রাণ খুলে হাসাতে যে পারে, সে সব রোগ সারাতে পারে মহারাজ। গোপালের সেই গুণ আছে। আর বুদ্ধির কথা যদি বলেন, তো গোপাল ছাড়া আর কে আছেন এখানে? গতবারে নবাবের চালে যখন আমরা সবাই মাত হয়ে গেলুম, গোপালই তো আমাদের বাঁচালো মহারাজ। তাই আমার মতে গোপালই শ্রেষ্ঠ।

রাজা : কবিরাজ মশাই, আপনার যুক্তি অকাট্য। বসুন আপনি। কবি, তুমি কিছু বলো—

কবি : নাদুস নুদুস পেটখানি তার
বুদ্ধি মাথায় ঠাসা।
জগৎ জানে নামটা গোপাল
বুদ্ধিতে সে খাসা।

রাজা : বাঃ তুমি তো বেশ ভালো বললে কবি। সবাই যখন গোপাল গোপাল করছো, তখন তাহলে...

মন্ত্রী : মহারাজ, আমারটা শুনবেন না?

রাজা : ওই দ্যাখো কাণ্ড, তুমি যে পাশে গম্বুজের মতো দাঁড়িয়ে আছো, খেয়ালই করিনি। বলো, বলো, তোমারটাও শুনি।

মন্ত্রী : আজ্ঞে মহারাজ, আমার মতে, শুধু কৃষ্ণনগর কেন, বিশ্বের মধ্যে সেরা বুদ্ধিমান আমাদের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র। তিনি মহান, তিনি উদার। তিনি প্রজাদের কথা কতো ভাবেন। প্রজাদের বিপদে আপদে পাশে এসে দাঁড়ান। নবাব বাহাদুর কতবারই আমাদের মহারাজকে বিপদে ফেলতে চেয়েছেন। প্রতিবারই তিনি হতাশ হয়ে ফিরে গ্যাছেন, মহারাজের বুদ্ধির কাছে কুপোকাত হয়ে। শুধু তাই নয়, আমাদের মহারাজ আমাদের বেতন প্রতিবছরই অনেকটা করে বাড়িয়ে দেন। তাই মহারাজ, আপনিই সেরা বুদ্ধিমান।

গোপাল : ঢালো ঢালো, তেল ঢেলে যাও। তা দেখো সেটি য্যানো আবার ভেজাল না হয়। তেল ঢেলে ঢেলে তুমি আজ মন্ত্রী হয়েছো। আরও অনেক দূর যাবে মন্ত্রী। তেল মেরে মেরে ভবিষ্যতে রাজা হয়ে গেলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।

রাজা : আঃ, গোপাল, এবার তুমি বলো, শুনি কী লিখে এনেছো।

গোপাল : নিজেই নিজেকে সেরা বুদ্ধিমান বলাটা আমার কাছে অস্বস্তিকর। তাই কবিতায় বলি—
রাজ্য চালান রাজামশাই
মন্ত্রী থাকেন পাশে,
তাঁরাই শ্রেষ্ঠ জগৎ জুড়ে
অন্তর্যামী হাসে।

ক বি তা

আমার কোনও কলাবউ নেই

সুকোমল দাশ

আমার কোনও কলাবউ নেই
তাই পৃথিবী নামক পুরোহিতের
নেই কোনও দায়— তাকে কাঁধে বয়ে
স্বর্গীয় স্নানের ঘাটে নিয়ে যাবার।
আমি তোমাকেই তাই কলাবউ ভাবি, আর
প্রতিশ্রুতির কাঁধে চাপিয়ে
ঐহিক স্নানের ঘাটে নিয়ে যাই।
সেই সৃষ্টির কাক-ডাকা ভোরে
করাই আমার মানস-নদীতে শরীরী অবগাহন।
স্বপ্ন, অভিলিপ্সা, আবেগ, তাড়না, অভিমান
অনুরাগ, বিরহ, আসক্ত
এবং যৌনতা—
এই নব উদ্ভিদ দল বেঁধে দিই তোমার শরীরে।
আরও বেশি করে গেরস্থ হওয়ার জন্য
অ-দাম্পত্য গোপনীয়তায় তোমার শরীরে
পরিয়ে দিই অদৃশ্যমান শস্প কোমল মায়া অপিধান
তুমি কলাবউ থেকে আমার শস্যবধূ হয়ে যাও
কোন সে ব্রহ্মমুহূর্তে
আর আমি তোমায় শস্যদেবী মনে করে নতজানু
হয়ে প্রার্থনা করি— যেনো এই আজন্ম বাউণ্ডুলে
তার দাম্পত্য ভুঁইয়ে ফলায় অভীষ্ট ফসল
অফুরান শস্যরাজি।